সৃজন নাট্যপত্র ২০২১

কলকাতা প্লেমেকার্স

সম্পাদক
ছত্রধর দাস

সৃজন

নাট্যপত্র

২০২১

কলকাতা প্লেমেকার্স

সম্পাদনা

ছত্রধর দাস

রূপালী

SRIJAN NATYAPATRA 2021
Edited by Chhatradhar Das

Published by Surjendu Bhattacharya, Rupali, Subhaspally, Khalisani
Chandannagar-712138, Hooghly, West Bengal

© Secretary, Kolkata Playmakers

First Published : 2022

Cover Designed by : Subhadeep

Typeset by : Datta Enterprise
Singur, Haripur, Hooghly, Pin - 712223

Printed by : New Kalimata Printers
19A/E/H, Goabagan Street, Kolkata-700 006

ISBN : 978-93-91776-03-9

Price : 150/-

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

বর্ণময় মোহিতদা — রাম মুখোপাধ্যায় ১১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বনাটক — ড. কল্যাণ মজুমদার ১৬

নাট্যব্রতী

বাংলা থিয়েটারের সম্পদ পাপড়ী বসু — ছত্রধর দাস ২৪

নাটক

চিত্রকর - তীর্থঙ্কর চন্দ ৩০

বর্তমান প্রযোজনা

চিত্রকর, সমাপন ৬৫

নতুন প্রযোজনা

সঞ্জীবন ৭৪

বিগত প্রযোজনা ৭৫

সমালোচকের কলমে

The Telegraph Review– Dipankar Sen ৭৬

বার্ষিক পরিক্রমা ৭৮

সৃজন অ্যালবাম ৮০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বনাটক

ড. কল্যাণ মজুমদার

সাহিত্যের সূচিপত্রের প্রায় সকল শাখাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নিজেকে একজন কবি বলে পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান স্বতন্ত্র। গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, কাব্যনাট্য নৃত্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাটক ইত্যাদি সর্বপ্রকার নাটক রচনার ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূর্যসমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সমকালীন বাস্তব বিষয় যেমন আছে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ইত্যাদি বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ থেকে অনুসন্ধান করে নিয়েছেন তাঁর নাটকের উপকরণ। তাঁর নাটক প্রধানত ভাবাত্মক, গীতিধর্মী এবং তত্ত্বচিন্তাবাহী। তাঁর নাটকের তত্ত্বচিন্তা সমকাল, সমাজ এবং ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে অন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন বা পূর্বকালের কোনো নাটকের প্রভাব তার নাটকে দুর্লক্ষ্য। নাটক নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁকে ঐতিহ্যানুসারী বলা যায় না, আবার তাঁর যথার্থ ভাবশিষ্য বা উত্তরসাধকও নেই। নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ ও নাট্যইতিহাস রচয়িতা ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন— "রবীন্দ্রনাথ আসিবার ফলে বাংলা নাটক তাহার পরিপূর্ণ আভিজাত্য এবং গৌরভ লাভ করিল। নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে দেখা যায় নাই এবং পরেও অনুসৃত হয় নাই।"[১]

রবীন্দ্র নাট্যভুবনে রূপক— সাংকেতিক বা তত্ত্ব পর্যায়টি সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা

উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলির মধ্যে যেগুলিকে রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্ব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেগুলি কালানুক্রমে এরকম—

'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়ন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২)।

রবীন্দ্রনাট্য ভুবনে এই তত্ত্ব নাটকগুলির স্থান বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের নাটকের একটি মৌলিক প্রবণতাই হচ্ছে রূপ থেকে অরূপে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে পৌছনোর চেষ্টা। সাহিত্যে বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে রূপক এবং সাংকেতিক কথা দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করা হয় সাংকেতিক রচনায়, কিন্তু অরূপকে রূপান্তরে দেখানোর চেষ্টা থাকে রূপক রচনায়। ''রূপক নাটকে একটি আপাত কাহিনি ও তার সমান্তরাল একটি নেপথ্য কাহিনির মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর বক্তব্য বিষয়ের প্রতিরূপ রচনায় প্রয়াসী হন। অন্যদিকে সাংকেতিক নাটকে কোনো নেপথ্য সমান্তরাল কাহিনি থাকেনা। থাকে রহস্যময় ও অনির্বচনীয় কোনো অনুভূতি বা সংবেদন।''[২]

বর্তমান ''যুগ ও যন্ত্রসভ্যতার জড়বাদী শক্তি এবং লোকাচার সংস্কারের বন্ধনদশা থেকে মানবাত্মার মুক্তি কামনার বাণী''[৩] রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক তথা তত্ত্ব নাটকগুলিতে মূর্ত হয়েছে।

চিরসুন্দরের মরমীয়া পূজারী রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাট্যসংঘাতের মূলে রয়েছে এক মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব প্রাণধর্মের সঙ্গে জড়ধর্মের দ্বন্দ্ব। এ হল সর্ববন্ধনমুক্ত আনন্দরসঘন মানবাত্মার সঙ্গে নিষ্প্রাণ যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। 'ডাকঘর'র অমল, 'রক্তকরবী'র নন্দিনী, 'অচলায়তন'র পঞ্চক, 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ এই চরিত্রগুলি সবাই মুক্ত প্রাণের বাণীবাহক। আর এর বিরুদ্ধে যে জড়শক্তি রয়েছে, তা হল— 'ডাকঘর'-এর গুরুজন শাসিত গৃহকারাগার, 'রক্তকরবী'তে আকর্ষণজীবী ধনতন্ত্র, 'অচলায়তন'র অন্ধসংস্কার, আর 'মুক্তধারা'র সাম্রাজ্যবাদী লৌহযন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকগুলিতে রয়েছে জড়শক্তির বিরুদ্ধে নিত্যপ্রাণ প্রবাহের নিত্যকালের বিদ্রোহের বাণী।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাটকের যে নাট্যরূপকল্প রয়েছে, তার একটা বিশেষ প্রবণতা হল রূপ থেকে অরূপে এবং ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে পৌঁছোনোর চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাটক হিসেবে যে নাটকগুলির নাম উল্লিখিত হল, সেগুলির রূপকধর্ম বা সাংকেতিক ধর্ম নিয়ে প্রখ্যাত সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রখ্যাত নাট্যঐতিহাসিক ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন— "একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনাকালে রূপক ও সাংকেতিক এই কথা দুইটি একটু শিথিল ও অসতর্কভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাথমিক সমালোচকেরা রূপক কথাটিই বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে কেহ কেহ সাঙ্কেতিক কথাটি প্রয়োগ করিলেও রূপকের সহিত ইহাকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন... ড. সুবোধ সেনগুপ্ত 'ডাকঘর' ও 'রাজা'— এই নাটক দুইখানিকে শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক বলিয়াছেন। অথচ প্রমনাথ বিশীর মতে ওই দুইখানি রূপক নাটক।"[৪]

আসলে রূপক ও সাঙ্কেতিক কথা দুটি একসঙ্গে উচ্চারিত হলেও এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরার চেষ্টা থাকে সাঙ্কেতিক রচনায় কিন্তু রূপক রচনায় থাকে রূপকে রূপান্তরে দেখানোর ইচ্ছে। সাঙ্কেতিক নাটকে থাকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ। অন্যদিকে রূপক নাটকে থাকে নৈতিক উদ্দেশ্যের সৌন্দর্যময় ছদ্মবেশ। রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বপ্রধান নাটকগুলিতে রূপক ও সাংকেতিক উপাদান মিলেমিশে আছে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকগুলিতে সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতায় চরিত্রসৃষ্টির প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বভাবনাকে আভাসে, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছেন। শুধু প্রকৃতিগতভাবে নয়, বহিরঙ্গের বিচারেও রূপক-সাংকেতিক-তত্ত্বনাটকগুলি একটু আলাদা রকমের। এই নাটকগুলিতে আছে ক্রিয়া বিরলতা, বহিঃসংযোগের স্বল্পতা এবং গীতিধর্মের প্রবলতা।

ইংরেজি সাহিত্যের সাঙ্কেতিক নাট্য আন্দোলনের পুরোধাব্যক্তিত্ব উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর নাটকে এ ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকগুলি উৎকর্ষের বিচারে বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাটকের সঙ্গে একই আসনে বসতে পারে। বাংলা ভাষায় তিনিই এ ধরনের নাটকের প্রথম রচয়িতা আর তাঁর হাত ধরেই তা চূড়ান্তরূপে বিকশিত হয়েছে। এই নাটকগুলির

অভিনয় মূল্যের সঙ্গে এর সাহিত্যিক মূল্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'শারদোৎসব' নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতির ঋতুচক্রের পালাবদলকে মানুষ যেমন মেনে নেয়, তেমনি সে যদি তার জীবনের সুখ, দুঃখ উভয়কেই সহজভাবে মেনে নেয়, তবেই সে আনন্দের সন্ধান পেতে পারে, খুঁজে পেতে পারে মুক্তির পথ - এই মর্মবাণীই শারদোৎসব নাটকে উচ্চারিত হয়েছে। এই নাটকে শরৎপ্রকৃতির লীলাকে দেখানো হয়েছে নানা প্রকার দৃশ্য ও প্রাকৃতিক নানা রূপকল্পের মধ্য দিয়ে। আকাশ, ধানের ক্ষেত, রৌদ্রছায়া, সোনার পদ্ম, সোনার ধান ইত্যাদি রূপকল্পের মাধ্যমে নাট্যকার শরতের আনন্দ-উৎসবকে মুখর করে তুলেছেন।

বৌদ্ধ কুশজাতকের কাহিনী অবলম্বনে 'রাজা' (১৯১০) এবং তার রূপান্তরিত সংস্করণ 'অরূপরতন' (১৯২৩) রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাটক। রাণী সুদর্শনা যে বাহ্য সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে প্রেমকে প্রিয়তমকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল সুরঙ্গমা ও ঠাকুর্দা সেই প্রেমকে আবিষ্কার করেছিল ভক্তিবিনম্র হৃদয়ের মধ্যে অবশেষে মোহের অগ্নিজাল ছিন্ন করে সুদর্শনা অন্তরের সত্যোপলব্ধিতে তার রাজাকে খুঁজে পেল বুকের মাঝে অরূপ রূপে। 'রাজা' নাটকের দুটি তত্ত্ব— একটি হল অরূপের মধ্যেই রূপের সার নিহিত আছে এবং অপরটি হল দুর্গম, দুঃখাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেই হৃদয়রাজের দেখা পেতে হয়। রাজার ভক্তরা রাজার সম্পর্কে নিজেদের মতো করে ভজনা করেছে— সুরঙ্গমা দাস্যভাবে, ঠাকুর্দা সখ্যভাবে, সুদর্শনা মধুরভাবে এবং কাঞ্চীরাজ শত্রুভাবে রাজার ভজনা করেছে। গীতাঞ্জলি পর্বের কাব্যগুলি রচনার সময় 'রাজা' নাটকটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই নাটকেও রয়েছে গীতাঞ্জলি পর্বের কাব্যের মতোই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রতিফলন। 'রাজা' নাটকের রাজাও ঈশ্বরের মতো অদৃশ্য। অন্যান্য মানবচরিত্র এখানে অসীম ও সীমার মধ্যে মিলনের যোগসূত্র।

'অচলায়তন' নাটকের কাহিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যবদানমালা'র একটি গল্প থেকে গৃহীত। এই নাটকে ধর্মের যুগপ্রাচীন রীতি ও আড়ম্বরের মূলে আঘাত হেনেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীনকালের মন্ত্রতন্ত্রের পটভূমিকায় প্রথা ও সংস্কারের চাপে অবরুদ্ধ মানবাত্মা এবং তা থেকে মুক্তিলাভের কথা ঘোষিত হয়েছে কাব্যে। আচার-বিচার, জপ-তপ, মন্ত্র-তন্ত্র যখন অচল অবরোধ সৃষ্টি করে তখন গুরু আবির্ভূত হয়ে

অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে মানবাত্মার পীড়নের অবসান ঘটায়। শুধু আচরণ কখনও ধর্ম হতে পারে না আর বাহ্যিক অনুষ্ঠানে অন্তরের ক্ষুধা মেটেনা— এই বিষয়টিই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন 'অচলায়তন' নাটকে। যে পুঞ্জীভূত সংস্কারের জড়তা মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে চলেছে প্রতিনিয়ত তাকে সচেতনভাবে আঘাত করবার জন্যই এরকম নাটক রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'ডাকঘর' নাটকটি যেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গাঢ়বন্ধ গীতিকবিতার মতো। এই নাটকটি সবরকম ভাবে বস্তুজগতের স্থূলতাকে বর্জন করেছে। এই নাটকের প্রতিটি সংলাপে চেতনার গভীরতম অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। অমল একটি রূপকল্পময় চরিত্র। সে সৌন্দর্য-পিয়াসী এবং সুদূরবিলাসী। অমলের আর্তি ও বেদনা প্রকাশিত হয়েছে 'ডাকঘর' নাটকে। অমল যেন মুমুক্ষু মানবাত্মার প্রতীক। জীবনব্যাপী রুগ্ন অমল অসীমের অভিসারী হতে চায়। রাজার চিঠি হল অমলের কাছে সেই অসীমের ব্যঞ্জনা। শেষ পর্যন্ত চিরনিদ্রার মাধ্যমে অমলের মানবাত্মা অসীমে মিশে যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন তাঁর কাব্যরচনার একটিমাত্র পালা হল, সীমার মধ্যে অসীমের মিলনসাধনের পালা। অমল এই অসীমের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। ডাকঘর অমলের জীবনে সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা বয়ে নিয়ে আসে।

জীবন ও মৃত্যু, শীত ও বসন্ত, জরা ও যৌবনের দ্বৈত সত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের পটভূমিতে ফাল্গুনী নাটকখানি রচিত। এই নাটককে ঋতুনাট্য বলা যেতে পারে। একদল তরুণ, যাদের নেতা হল চন্দ্রহাস, তারা পরিকল্পনা করেছিল যে আত্মগোপনকারী জরা-বৃদ্ধকে তারা গুহার বাইরে নিয়ে আসবে। কিন্তু বৃদ্ধকে যখন আনা হল, তখন দেখা গেল— তিনি রিক্ততার প্রতীক নন। তিনি বসন্তের পূর্ণতার প্রতীক। আর তিনিই বালকদলের নেতা।

অধিকাংশ নাট্যসমালোচকের মতে 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটক রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা এবং ভাব-চিন্তার স্বর্ণখনি। এই নাটক বিশ্বের যে কোনো প্রতীক নাটকের সমকক্ষ। যন্ত্রযুগ ও মানব সভ্যতার দ্বন্দ্ব সংঘাতের পটভূমিটতে এই নাটক রচিত। এখানে আছে যৌবনের আনন্দময় জীবনচেতনার প্রকাশ। এই নাটকের মর্মকথা হল মুক্তি চেতনা। প্রথমে 'যক্ষপুরী', তারপর 'নন্দিনী' এবং সবশেষে 'রক্তকরবী' নামে এই নাটক প্রকাশিত হয়।

এখানে সুবর্ণলোভী রাজা যন্ত্রশক্তির প্রতীক, নন্দিনী, হল শ্যাম বসুন্ধরার প্রতীক আর রঞ্জন যৌবনের প্রতীক। আধুনিক কালের সভ্যদেশের মানুষ ধনমদে মত্ত হয়ে প্রকৃতির সহজ দান ও সরল সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেছে। এরই প্রতিবাদে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপরে প্রেমের এবং মৃত্যুর উপরে যৌবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। জ্ঞান ও শক্তি যদি লোভের অতলে নিমজ্জিত না হয়ে প্রকৃতির মোহমুক্ত ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়, তবেই সেই শক্তির সার্থকতা। এমন ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে 'রক্তকরবী'তে।

'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসভ্যতার সংকট এবং তা থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছেন। মানুষ তার বিজ্ঞান সাধনার মাধ্যমে মানবকল্যাণের জন্য যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, সাম্রাজ্যবাদ তাকেই আয়ত্ত করে মানুষকে নির্যাতন করেছে, তার তৃষ্ণার জল রোধ করেছে। রাজকুমার অভিজিৎ নিজের প্রাণকে বলি দিয়ে মুক্তধারাকে মুক্ত করেছে। প্রকাশিত হয়েছে সত্য। মানুষ ও মানুষের শুভবুদ্ধির জয় ঘোষিত হয়েছে এই নাটকে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি তত্ত্ব নাটকের নাম 'কালের যাত্রা'। এই নাটকে মহাকালের অচল রথ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই সারথিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে শূদ্রের শক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে দেখিয়েছেন মানুষের পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষেই মহাকালের রথ বা জীবনের বিকাশধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। জনসাধারণের পারস্পরিক মিলনে সেই রথ আবার কিভাবে সচল হয়, তা এই 'কালের যাত্রা' নাটকে তা দেখিয়েছেন নাট্যকার।

একথা সর্বজনবিদিত আর সত্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মৌল স্বরূপ গীতিধর্মীতা। একটি নিবিড় মন্ময়তাই তাঁর সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর নাটকও এই ভাবধর্মীতা বা গীতিধর্মীতা থেকে মুক্ত নয়। ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এডওয়ার্ড টমসন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের dramatic work is the vehicle of ideas rather than the examination of action. অবশ্য আমরা বুঝি যে গীতিধর্মীতা রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাট্যগুণকে ক্ষুণ্ণ না করে বরং উন্নত করেছে। আধুনিক জীবনের সংশয় দ্বন্দ্বের পটে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট মূল্যবোধ, অধ্যাত্ম বিশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন নাট্য আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং যথেষ্ট সফল হয়েছেন।

ইউরোপীয় সাংকেতিক নাটকের দুর্জ্ঞেয়তা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে সকল সংশয় দ্বন্দ্বের অবসানে সত্যের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে স্পষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলি তাঁর প্রতিভার মৌলিকতায় ভাস্বর। রবীন্দ্র নাটকের ধারায় এ এক স্বতন্ত্র— স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবাহ। তাঁর এই তত্ত্ব নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ।

তথ্যসূত্র :

১। ঘোষ, অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ২৪২।

২। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, ''সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৫।

৩। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'বাংলা সাহিত্য পরিচয়', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯।

৪। ঘোষ, অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ২৮৯।